Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
Volume-VIII, Issue-II, October 2019, Page No. 01-06
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

শেখর দাশের 'বিন্দু বিন্দু জল' : একটি বিশ্লেষণাত্মক অধ্যয়ন

ড. অভিজিৎ চক্রবর্তী
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, করিমগঞ্জ কলেজ, করিমগঞ্জ, আসাম

Abstract

Shekar Das is one of the prominent short story writers of Barak Valley. He also wrote novel named 'Bindu Bindu Jol' in the year 2004. Main theme of this novel is partition. Partition Was the historic tragedy of Indian subcontinent. In this novel Shekar Das enlightens us about the impact of this historical partition on the lives of common people. During the time of partition so many People lost their home and life. Many people become 'Refugees'. In this novel Shekar Das portrays this panic situation. In this research study we try to find out the actual scenario of the partition.

***Keyword.** দেশভাগ, সুরবালা, বসুমতী, সন্ত্রাস, স্বপ্ন।*

১

শেখর দাশ বরাক উপত্যকা তথা উত্তর-পূর্ব ভারতের একজন লব্ধ প্রতিষ্ঠিত গল্পকার। উত্তর প্রদেশের লক্ষ্ণৌ শহরে ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের ২১শে মে শেখর দাশের জন্ম হয়। গল্পের হাত ধরে পেশায় শিক্ষক শেখর দাশের বরাক উপত্যকার বাংলা গল্পবিশ্বে পথ চলা শুরু হয়। শিলচর থেকে প্রকাশিত ছোট পত্রিকা 'শতক্রতু'তে তাঁর প্রথম গল্প "ক্রমশ তাপ" (১৯৭৩) প্রকাশিত হয়। এরপর একে একে তিনি লিখেছেন 'কোষাগার','ফেরারি', 'ডাইনোসরের ফুসফুস' ইত্যাদি বিখ্যাত সব গল্প। তাঁর প্রথম প্রকাশিত গল্পগ্রন্থ "কোষাগার" পাঠক মহলে ব্যাপক সমাদৃত হয়েছিল। এই গল্প গ্রন্থ অসমিয়া ভাষায়ও অনুদিত হয়। বিশ শতকের সত্তর ও আশির দশকে বরাক উপত্যকার বাংলা গল্পবিশ্ব দাপিয়ে বেড়িয়েছেন শেখর দাশ। 'বিশ শতকের সত্তর ও আশির দশক মূলত শেখর দাশের দশক'। (তপোধীর ভট্টাচার্য 'ঈশান'১৯০)।

গল্পকার শেখর দাশের হাতে রচিত হয় দেশভাগের প্রেক্ষাপট নিয়ে বরাক উপত্যকার প্রথম ঔপন্যাসিক আখ্যান "বিন্দু বিন্দু জল"। একটি অন্তরঙ্গ আলাপচারিতায় শেখর জানিয়েছেন ' বরাকভ্যালিতে দেশভাগ নিয়ে কোনও উপন্যাস নেই,ঠিক করলাম দেশভাগ নিয়ে উপন্যাস লিখতে হবে।"(তদেব) দীর্ঘ পরিকল্পনা করেই দেশভাগকে ভিত্তি করে এই আখ্যান রচনা করেছেন শেখর।

'বিন্দু বিন্দু জল' নাতিদীর্ঘ একটি আখ্যান। ষোলটি পরিচ্ছেদের এই আখ্যান পাঠ করতে করতে মনে হয় কোনো চলচ্ছিত্র দেখছি। চোখের উপর একের পর এক দৃশ্যপট ভেসে ওঠে। তপোধীর ভট্টাচার্যের ভাষায় "শেখর লিখেছেন আখ্যান ধরন চিত্রনাট্যের।কখনও ফ্ল্যাসব্যাক, কখনও মন্তাজ"।(পৃঃ ৯৫; ২০১৬)। সাংকেতিক বয়ানে আখ্যানের শুরুতে আমাদের সূত্র ধরিয়ে দেন শেখর এভাবে,' প্রশস্ত উঠোনের তুলসী বেদির কাছে এলেন

সুরবালা।বড় এক পিলসুজ আছে পাকা বেদিতে। আজ পরিপূর্ণ করে ভরলেন তেল। অন্যদিন এত তেল দিতে হয় না। ঘন্টাখানেক জ্বলে এমন পরিমান দিলেই হয়। আজ দিলেন পিলসুজ।... তেলভরা শেষ হলে সুরবালা কিছু সময় নিশ্চুপ দাঁড়ালেন।বেদির উপর আলতো হাতের আঙুল। কাল কে দেবে তেল?" (পৃ. ১)। পূর্বপাকিস্তানের নামহীন এক অজ পাড়াগাঁয়ে আজই শেষ দিন এক হিন্দু পরিবারের। কেননা তারা দেশভাগের বলি। চৌদ্দপুরুষের বাস্তুভিটে ছেড়ে এক অজানা ভবিষ্যতের পথে পাড়ি দিতে হবে তাদের। চৌদ্দপুরুষের ভিটায় তাই শেষ সন্ধ্যা প্রদীপ জ্বালিয়ে দিচ্ছেন সুরবালা। সুরবালার মত লাখ লাখ হিন্দু কূলবধূ এভাবে শেষ সন্ধ্যাপ্রদীপ বাস্তু ভিটেয় জ্বালিয়ে দিয়ে দেশভাগের সময় দেশ ছেড়েছে। তারই মর্মান্তিক আখ্যান 'বিন্দু বিন্দু জল'।

আখ্যানে বর্ণিত হয়েছে দেশভাগ জনিত ট্রাজেডির ফলে পূর্ব -পাকিস্তানের অখ্যাত নামহীন এক পল্লীর আপাত নিরীহ দুটি পরিবার নলিনী-সুরবালা ও দ্বিজেন-বসুমতীর পরিবারের বিপর্যয়ের কথা।এই দুটি পরিবারের বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছে দেশভাগের সময়ে হাজার হাজার পরিবারের বিপন্নতার চিত্র। অদূরদর্শী দেশভাগের পরিনাম ভোগ করতে হয়েছে নিতান্ত ছাপোষা সাধারণ মানুষদের। ধর্মীয় উন্মাদের হাতে পড়ে শুধু চৌদ্দপুরুষের ভিটে নয় প্রাণও হারিয়েছে অজস্র মানুষ।নলিনী-সুরবালার মত কত মধ্যবিত্ত মানুষের স্বপ্ন-সংসার ছারখার হয়ে গেছে, বসুমতীর মত কত নারীর কোল খালি হয়েছে, পারুল-রাতুলের মত কত শত শিশু প্রাণ হারিয়েছে,দ্বিজেনের মত কত কত মানুষের প্রিয় ভিটে জ্বলে ছাই হয়েছে, তার কী কোনও হিসেব আছে? তারই এক ঝলক এই আখ্যানে তুলে ধরেছেন ঔপন্যাসিক শেখর।

২

"বিন্দু বিন্দু জল" আখ্যানে মাত্র তেইশটি পরিবারের একটি নামহীন হিন্দু গ্রাম দেশভাগের নির্মম পরিস্থিতির শিকার হয়ে কিভাবে ধনজন সর্বস্ব হারিয়ে সর্বহারা হয়ে দেশ ছেড়েছে তারই করুণ কাহিনি তুলে ধরা হয়েছে। দেশভাগের অভিশাপে অভিশপ্ত হিন্দুরা যে পূর্ব পাকিস্তানে থাকতে পারবে না পেশায় ডাক্তার নলিনী সে কথা আঁচ করতে পেরেছেন, তাই তিনি ধর্মীয় সন্ত্রাসীদের গ্রাম আক্রমণ করার আগেই দেশ থেকে ইণ্ডিয়া পালিয়ে আসেন।শৈশবের বন্ধু বাছিত আলি তাকে ইণ্ডিয়ায় পার করে দেয়।কিন্ত বাচিত যখন নলিনীকে ইণ্ডিয়াতে পার করে দেবার কথা বলেছিল,'- আজ রাইইতে পার কইরা দিতে হইব।' তখন নলিনীর অবাক বিস্মিত উত্তর' –কী পার করে দেবে?' আর তিনি যখন ইণ্ডিয়া এলেন তখন,'সামনে ভীষণ অনিশ্চিত ভবিষ্যত।ওদের পড়ে আছে কয়েক লক্ষের অস্থাবর, স্থাবর আর প্রিয়জন।' (পৃ; ২৪৩)

কথা ছিল ইণ্ডিয়া এসে থাকার ব্যবস্থা করে পরিবারের বাকি সদশ্যদের ইণ্ডিয়ায় নিয়ে যাবেন। বন্ধু বাছিত আলি তাকে বলেছিল,'একদম ঘাবড়াইয়েন না ডাক্তারবাবু,ওগোরে আমরা পার কইরা দিমু। খোদার দোয়া হইলে এই পারেশানি আর কয়দিন'। (পৃঃ২৪১)সাধারণ মানুষের এই বিশ্বাস শেষ পর্যন্ত বাস্তবের মাটি স্পর্শ করতে পারেনি। বাছিত কথিত "পারেশানি" কোনোদিন আর শেষ হয়নি। নলিনীদের মতো ছিন্নমূল মানুষের আর কখনও দেশে ফেরা হয়নি। আত্মীয়-স্বজনহীন পরদেশে সামাজিক বন্ধনের বাইরে উৎকেন্দ্রীকভাবে বেড়ে ওঠা বরুণ হারুদের সংসারে নলিনী আর সুরবালার শেষজীবন মোটেই সুখের হয়নি।

নলিনী ইণ্ডিয়া আসার পর খুব দ্রুত পূর্ব পাকিস্তানের পরিস্থিতি বদলে যায়। সুরবালা তার কোনও খবর না পেয়ে উৎকণ্ঠিত হয়ে আছেন, 'সেই যে ওরা সীমানা পার করে খবর দিল,'বর্ডার' পেরিয়েছেন নির্বিঘ্নে।এর পর আর কোন ও খবর নেই। কোথায় উঠল'। এসব এলোমেলো চিন্তা ভাবনা কুরে কুরে খাচ্ছে সুরবালাকে। তারপর সুরবালা তিন সন্তান বরুণ,হারু আর পারুলকে নিয়ে বিশ্বস্ত লোক রিয়াজ,কুমদদের সহায়তায় গোরুর গাড়িতে করে ইণ্ডিয়ার দিকে রওয়ানা দিলেন।ছোট্ট মেয়ে পারুল মনে প্রাণে বিশ্বাস করে সে আবার তার দেশের বাড়িতে ফিরে আসবে।ফিরে আসার সময় যাতে সহজে পথ চিনতে পারে সেজন্য সে বাবার দেওয়া হাতের প্রিয় রঙ্গিন চুড়ি ভেঙে

ভেঙে পথে ছড়িয়ে চিহ্ন রেখে যায়। যাতে এই চিহ্ন দেখে দেখে ওরা আবার ফিরে আসতে পারে,'কেন এমন ভাঙছিস সব,কী হয়েছে তোর? মা সুরবালার এই প্রশ্নের উত্তরে পারুলের সহজ সরল উত্তর 'আবার যখন ফিরে আসব, এই চিহ্নগুলো দেখে দেখেই পথ চিনতে হবে।না হলে ফিরব কী করে?' (পৃ-২৪৭) পারুলের এই উত্তর আমাদের বিহ্বল করে।ছোট্ট শিশুটির বিশ্বাস ছিলো ওরা ফিরে আসবে প্রিয় বাস্তুভিটে। আর শুধু কি পারুল এভাবে পথচিহ্ন রেখে যাচ্ছে ফিরে আসবে বলে? অগণন নিরীহ মানুষ এই ক্ষীণ আশার প্রদীপ জ্বালিয়ে বাস্তুভিটে ছেড়ে চলে যাচ্ছে ফিরে আসবে বলে, 'কাকভোরে বেরিয়েছিলেন তিন সন্তানসহ। যতটা না নিলে হয়, ঠিক ততটা সামগ্রী নিয়েছেন আর আঁচলে সেই চাবির গোছা। ঘরদোর সব খোলা আছে তবু পিঠে ঝুলছে আপাতত তাৎপর্যহীন পুরুষানুক্রমের চাবির গুচ্ছ। বেরবার সময় লক্ষ করেছেন তুলসীবেদীতে তখনো জ্বলজ্বল করছিল পিলসুজের শান্তশিখা। এভাবেই আলোর শিখা জ্বালিয়ে রেখে চলে যাচ্ছে অগণিত মানুষ। এ শুধু নিছক পিলসুজ নয়। গৃহস্থ জ্বেলে দিয়ে এসেছে ক্ষীণ আশা, যদি আবার ফিরে আসা যায়।' (পৃঃ ২৪৭) রাষ্ট্রের কুটিল আবর্ত এই নিরীহ মানুষদের জানা ছিল না,জানার কথাও নয়। তারা যে তাদের প্রিয় স্বদেশে আর ফিরতে পারবে না এটা তারা স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি। দেশভাগ অগণন মানুষকে এভাবে বাস্তুহীন ও দেশহীন করে দিলো চিরদিনের জন্য।

যে পারুল স্বদেশে ফিরে আসার জন্য হাতের প্রিয় কাঁচের চুড়ি ভেঙ্গে পথে চিহ্ন রেখে দিয়ে এসেছিলো। সেই পারুল রিফ্যুজি ক্যাম্পের অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে ওলাউঠায় পড়ে মারা গেলো। আমরা দেখলাম রিফ্যুজি ক্যাম্পের দক্ষিণের ছড়ার পারে পারুলকে শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।হঠাৎ করেই যেন ঘটনাটা ঘটে গেল। মাঝখানের কোনো ঘটনা আমাদের জানাননি ঔপন্যাসিক। উপন্যাসের মধ্যে অনেকটা ছোটগল্পের ধরণ আমদানি করেছেন লেখক। ছোটগল্পকার শেখর ছোটগল্পের আকল্পকে ভুলতে পারেননি হয়তো।যাই হোক পারুল মারা গেছে এটাই সত্য। দেশের বাড়িতে ফিরে আসার স্বপ্ন নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ছিল যে বালিকা,'এক বালিকার শেষকৃত্যের আগুন জ্বলে অবিরাম।... নিজের প্রিয়জনের চোখের সামনে নন্দাইকোঠায় কিত কিত খেলা করা দুরন্ত পারুল মুছে যায় চিরতরে।' (পৃঃ২৫৩) দিগরকোনা রিফ্যুজি ক্যাম্প থেকে লেখা নিলীনের বড় ছেলে বরুণের চিঠি থেকে আমরা জানতে পারলাম ক্যাম্পের অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে ওলাউঠায় পারুল মারা গেছে।এইটুকুই মাত্র।

রিফিজি ক্যাম্পে সুরবালা তার দুই ছেলে বরুণ হারু আর মেয়ে পারুলকে নিয়ে উঠেছেন। এখানে পারুল মারা গেল। পারুলের মৃত্যুরপর কিভাবে নলিনীর পরিবারের পুনর্মিলন হল এই প্রসঙ্গ আখ্যানে আর আসেনি।এরপর সুরবালাকে আমরা আবিস্কার করলাম সরলার ঘরে। সরলা বরুণের স্ত্রী। আশ্চর্য দ্রুত তালে এতটা সময় পেরিয়ে গেল। লেখক তার বিন্দু বিসর্গ উল্লেখ করলেন না।আখ্যান যেন খুব দ্রুত এক কক্ষপথ থেকে আরও এক কক্ষপথে বিচ্যুত হল। বরুণ হারু সরলা সাধনার মধ্যবিত্তীয় পরিবারের গোলকধাঁধায় দেশভাগের আখ্যান পথ হারিয়ে গেল যেন।

৩

দেশভাগের নিষ্ঠুর পরিহাসের নির্মম পরিণতি দেখানো হল দ্বিজেন-বসুমতীর আপাত শান্ত জীবনের করুণ পরিণতির মধ্য দিয়ে।দেশভাগের সময় যে সাম্প্রদায়িক আক্রমণ নেমে এসেছিল আপাত শান্ত হিন্দু গ্রামে তারই বলি হয় দ্বিজেন-বসুমতী ও তাদের শিশুপুত্র রাতুল। মাঝরাতে হিন্দু গ্রাম আক্রান্ত হয়। এই আক্রমণ প্রতিহত করার মতো সমর্থ পুরুষ ছিল না গ্রামে। ভয়ে নারী-পুরুষ-আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সবাই পালাতে লাগল। ভয়ার্ত হিন্দুরা প্রাণের ভয়ে যে যেদিকে পারছে লুকোনের চেষ্টা করছে। ঔপন্যাসিকের বয়ানে,আক্রমণের এক মর্মস্পর্শী ছবি ধরা পড়েছে 'একজন মধ্যবয়স্ক চেঁচিয়ে বললো, না না ওদিকে না। নাটমন্দিরে জড়ো হলে সবাইকে পেয়ে যাবে। বন্দুক আছে ওদের। ওরা সংখ্যায় বেশী, অনেকজন হতে পারে। বাঁশবনের দিকে দৌড়াও সবাই। যে যেমন পারো ছিতরে পড়ো রে।

এ গ্রামে আক্রমণ প্রতিহত করার মতো যুবক ও পুরুষের সংখ্যা কম।নিরীহ গৃহস্থ সবাই। নাটমন্দিরের পথ ছেড়ে সবাই ছুটলো মাঠের দিকে।মাঠে পায়ের পাতা জল,কাদা,পুরুষেরা ছুটছে কিন্তু বাচ্ছা নিয়ে স্ত্রীলোকেরা কাহিল। দু-একজন ছিটকে পড়েও গেল। একজনের কাঁখ থেকে দূরে প্রায় উড়ে পড়েছে বছর তিনেকের একটা মেয়ে।জল ও নরম মাটি বলে তেমন চোট পায়নি। তবু ঘুমন্ত চোখে আচমকা ছিটকে পড়ায় জোরে চেঁচাতেই ডান হাতে সজোরে চেপে ধরেছে মুখে ওর মা।কান্নার শব্দের হদিশ যেন ওরা না পায়।

... ছুটন্ত বালকের হাত ধরে মাও ছুটছে। বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা তেমন দৌড়াতে পারে না।তবু ছুটছে। কোথাও না কোথাও লুকোলে যদি প্রাণ বাঁচে। একমাত্র ভরসা ঘন বাঁশবন। (পৃঃ ২৩৪-৩৫)

নিজের চৌদ্দপুরুষের বাস্তুভিটেয় পুরুষানুক্রমে বসবাস করে আসা হিন্দুরা দেশভাগের অভিশাপে অভিশপ্ত হয়ে প্রাণ বাঁচাতে এভাবে পালাতে থাকে। এর থেকে বেদনাদায়ক ট্রাজেডি আর কিছু হতে পারে না। কখনো কখনো এভাবে পালাতে গিয়ে দ্বিজেন- বসুমতির মতো কেউ কেউ নিজের দুধের শিশুকে বিছানায় রেখে শিশুর পাশবালিশকে কোলে নিয়ে পালিয়ে গেছে। যখন বুঝতে পারে তখন সবকিছু শেষ। এরকম এক হৃদয়বিদারক ও মর্মস্পর্শী ছবি আখ্যানে পাওয়া যায়,'আতঙ্কিত চিৎকার ও শব্দে বসুমতী উঠে বসেছে। হল্লাটা এখন হচ্ছে গ্রামের মাঝামাঝি।ঠেলে তুলল দ্বিজেনকে। মাঝরাত অবধি সজাগ থেকে চোখ লেগেছে একটু আগে দুজনের। আধঘন্টাও ঘুমোয়নি। একমাত্র সন্তান রাতুল, ঘুমোচ্ছে নিশ্চিন্তে।

ধড়ফড়িয়ে উঠে দ্বিজেন বললো,দেখছো কী।ওকে কোলে নিয়ে বেরোও তাড়াতাড়ি।...

ঘর ছেড়ে ওরা ছুটলো মাঠের দিকে। একবার দরজটা ভেজানো হলো কেবল, তালা দিল না। সে অবকাশ নেই। উগ্র কোলাহল ছড়িয়ে পড়েছে গোটাগ্রামে। হামলাকারীরা পুরো দখল করে নিয়েছে। প্রায় সবাই,মাঠ পেরিয়ে ছুটেছে বাঁশবনের দিকে।... ত্রাস বাড়ে বাঁশবনে।হঠাৎ খেয়াল হয় বসুমতীর - অনেক সময় হলো ছেলেটা কিছুই খায়নি। একটানা ঘুমোচ্ছে। শেষরাতে রোজ জেগে ওঠে। চেঁচেমেচি করে। তখন বুকের দুধ চাই। আজ এতো চুপটি করে ঘোমোচ্ছে কোল চিপকে। সেমিজের বাঁধন খুলে ঘুমন্ত ছেলের মুখে স্তন্য দিলো বসুমতী। টানছে না। চুষছে না একবারো। নাড়াচাড়া করলো ঘুমন্ত ছেলেকে। কী হলো,আজ খায়না কেন? অবাক লাগে বসুমতীর... নাড়া দেয় বসুমতী। তবু নড়ে না একী! কী হলো রে! কাতরে উঠলো অসহায়। প্রায় জোরেই বললো, কী হয়েছে।

-দেখো।
-কী দেখবো?
-ও তো সে নয়।
কী নয়!
-ও নয়।
-কী?

তারপর গলা ছেড়ে উৎকণ্ঠিত বসুমতীর হাহাকার শোনা গেল বাঁশবনের স্যাঁতস্যাতঁ অন্ধকারে।...

বসুমতী আর কিছুই বলতে পারলো না। অন্ধকার বাঁশবনে আরও জোরে বিলাপ করে উঠলো। ত্রাসে পালিয়ে আসার সময় কী আনতে কী এনে ফেলেছে।

কোলের ছেলের ভেজানো পাশবালিশ।বসুমতী চিৎকার করে উঠতেই দ্বিজেন ওর মুখ চাপা দিয়ে তাকালো দূরে। ওদিকে গোটা গ্রাম জ্বলছে তখন দাউদাউ। এগারো মাসের রাতুল রয়ে গেছে ওখানে।একা বসুমতী মূর্ছা যায়। (পৃ; ২৩৭-৩৮-৩৯)

পরিস্থিতির গুরুত্ব বোঝানোর জন্য দীর্ঘ উদ্ধৃতি ব্যবহার করা হলো।এভাবে পূর্ব পাকিস্তানে গ্রামের পর গ্রাম আক্রান্ত হয়েছে। জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে ধনজন সমস্ত কিছু। শিশুপুত্র রাতুলকে উদ্ধার করতে গিয়ে হামলাকারীর কবলে পড়ে প্রাণ হারায় দ্বিজেন। দ্বিজেন যে প্রাণ হারিয়েছে বসুমতী একথা কোনোদিনও জানতে পারে না। দ্বিজেন বাঁশ বনে ফিরে না আসায় পরদিন নিজের গ্রামের ভিটায় ফিরে বসুমতী যা দেখল, তা এককথায় হৃদয় বিদারক,'নিজের বাড়ির সামনে যখন দাঁড়াল,কোনকিছু আর অবশিষ্ট নেই।' (পৃঃ ২৬৩) বাসগৃহ পুড়ে ছাই এদিকে সে দিকে পড়ে আছে পরিচিত জনদের মৃতদেহ কয়েকটা খণ্ডিত লাশ পড়ে আছে ইতস্তত, কোনোটা পুড়েছে এমন -চেনা যায় না। একটা লাশের বাঁ পায়ের হাঁটুর তলায় পুরনো কাটা দাগ - এই চিহ্ন দেখে বুঝতে পেরেছিল বসুমতী - আধপোড়া,তলপেটে ধারালো অস্ত্রের ক্ষতচিহ্ন সহ ভোম্বল -ওর দেওর। দ্বিজেনের জেঠার মধ্যম ছেলে। অবনী জেঠাকেও চিনতে পেরেছিল।বুক ও পেট জুড়ে ফালা ফালা দাগ দা'র'...বসুমতী ভাবছে রাতুলের বাবা কোথায়? ছেলেকে নিয়ে কী চলে গেল আরো নিরাপদ অন্য কোনোখানে নিশ্চয় গেছে নাহলে বাপবেটা আর যাবে কোথায়? নিজেকে অবিশ্বাস্য শক্তিতে আশ্বস্ত করে বসুমতী। (পৃঃ ২৬৪-২৬৫) যতোই আশ্বস্ত করুক নিজেকে, শেষ পর্যন্ত শিশুপুত্র রাতুল আর স্বামী দ্বিজেনের শোকে উন্মাদ হয়ে যায় বসুমতী।দেশ ছেড়ে, গ্রাম ছেড়ে সবাই যখন চলে যাচ্ছে তখন স্বামী ও পুত্রের আশায় তাদের পুড়ে যাওয়া ভিটেতে বসে অপেক্ষা করে বসুমতী। তার গ্রামের সম্পর্কিত দেবর ভবেশ আসে তাকে তাদের সঙ্গে নিয়ে যেতে এসেছে কিন্তু সে রাজি হয় নি। বসুমতীর তীব্র আশা। ওরা যদি আমার খোঁজে এখানে এসে আমায় না পায়। এই 'আশা নিয়ে সব হারানো বসুমতীরা অনন্তকাল অপেক্ষা করতে থাকে। (পৃঃ ২৬৬)

দ্বিজেন -রাতুল ওরা কেউ যে বেঁচে নেই একথা আমরা জানলাম ভবেশের কাছ থেকে, 'ভব থমকে যায়। কী বলবে? গ্রামের দক্ষিণে, নিচু জলা জায়গায় হেলেঞ্চার ঝোপে, সে একটু আগে দেখে এসেছে অর্ধদগ্ধ মৃত রাতুল সহ দ্বিজেনের লাশ। মাথা ফেটে চৌচির। কাউকে বলেনি।বলে কী লাভ? সুতরাং বসুমতীকে বলল না বৃত্তান্ত।(তদেব) অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' উপন্যাসে পাগল ঠাকুরের মৃত্যুর খবর যেভাবে তার পরিবারের কেউ জানতে পারে না কোনোদিন, ঠিক সেভাবে শেখর দাশের'বিন্দু বিন্দু জল' উপন্যাসের বসুমতীরও দ্বিজেন-রাতুলের মৃত্যুর খবর জানা হয় না কোনোদিন।

বসুমতীর একগেয়েমিতে বিরক্ত হয়ে যদিও একবার ভবেশ বলেছিল, 'নেই সব শেষ হয়ে গেছে।' ভবেশের একথা বসুমতী বিশ্বাস করেনি। তার বিশ্বাস'ওরা আসবে। ওরা শেষ হয়ে যায়নি। আসবে। আমার খোঁজে আসবে।' (পৃঃ ২৬৬)

স্বামী-পুত্রের শোকে বসুমতীর মস্তিষ্ক বিকৃত হয়ে যায়। ভবেশরা জোর করে বসুমতীকে সঙ্গে নিয়ে দেশ ছেড়ে ভারতের দিকে পালিয়েছিল। কিন্তু মনোবিকলনের শিকার বসুমতী দলছুট হয়ে যায়। পরে আর একদল দেশ উৎখাত মানুষের সাথে সে ইণ্ডিয়ার শরণার্থী ক্যাম্পে আসে। সেখানেও তার কোলে ছিল সেই পাশবালিশ। যে পাশবালিশকে ঘুমের ঘোরে রাতুল মনে করে তুলে নিয়ে গেছিল সেদিন রাতে বাশঁবনে লুকিয়ে প্রাণ বাঁচাতে।সেই পাশবালিশই তার জীবনের যেন শেষ সম্বল।যেখানে তার শিশুপুত্রের কচি শরীরের গন্ধ লেগে আছে,'বসুমতী বালিশের গন্ধ নেয়। ওখানে রাতুলের পুঞ্জিভূত ঘ্রাণ। ওকে আর বেশি বিঘ্নিত বিপন্ন করে। তাই বুক চাপড়ে জোরে জোরে কাঁদে। আকাশের পাখিরা দূরে সরে যায়। এমন হাহাকার ওদের বুক বিদীর্ণ করে দেয়। এবার আশ্রয় নিল ধানমিলের সামনে বটতলায়। বিষয় বলতে ঐ বালিশ।'(পৃঃ২৭৩)।এভাবে অগণন বসুমতী রাতুল হারা দ্বিজেন হারা হয়েছিল দেশভাগের নির্মম পরিহাসে। বসুমতী সেই সব বর্গ মানুষের প্রতিনিধি।

আত্মীয় পরিজনহীন ক্যাম্পে মস্তিষ্ক বিকৃত বসুমতী ধর্ষিত হয়েছে বারংবার। ফলস্বরূপ বসুমতীর আরও একটা ছেলে শিশু জন্মায়।কীভাবে এই সন্তানের জন্ম হল তা জানাননি লেখক। আমাদের সঙ্গে তার যখন পরিচয় হলো তখন তার বয়স সাত, 'বয়েস সাত ছুঁয়েছে গত আশ্বনে'। তাকে সে পরিচর্যা করতে অক্ষম। 'বসুমতী ওকে দূর দূর

করে'। (পৃঃ ৩২০) নাছোড়বান্দার মতো এই ছেলেটাও ছায়ার মতো তার সঙ্গে থাকে। বসুমতী মানুষদের ঢিল ছুঁড়ে। তার নাম পড়ে যায় 'ঢিলানী'। দেশভাগ এভাবে মানুষের আত্মপরিচয় নামধাম সমস্ত কিছু বদলে দিয়ে এক করুণ ইতিহাসের জন্ম দিয়েছে। ভারতীয় উপমহাদেশে দেশভাগ যেন এক দগদগে ক্ষতচিহ্ন। পিতৃপরিচয়হীন নামহীন বসুমতীর ছেলেটাও এই নির্মম ইতিহাসের ক্ষতচিহ্নের মতো এক ক্ষতচিহ্ন যেন। ঢিলানী তার ছেলেটাকে তাড়িয়ে দেবার চেষ্টা করে। সে তবু সঙ্গ ছাড়া হয়না। একদিন এই ছেলেটাকে সে ঢিল ছুঁড়ে মারে।আহত ছেলেটা উল্টো বসুমতীকে ঢিল ছুঁড়ে মারে। ঢিল তার মাথায় এসে লাগে, তার মাথা ফেটে রক্ত বের হয়। আঘাত লাগার ফলে,'বসুমতীর পুরোনো চেতনা একটু একটু ফিরে আসে, আবার মিলিয়ে যায়।মিলিয়ে যায় আবার ফিরে আসে।'(পৃঃ ৩২৩) বালক যখন তার গায়ের জামা দিয়ে বসুমতীর মাথার ক্ষত স্থানের রক্ত মুছে দেয় তখন, 'বসুমতী ওর দিকে তাকিয়ে বলে আস্তে,বেশি জোরে লেগেছে রে? তোর ব্যথা হচ্ছে?' (পৃঃ ৩২৩) বসুমতীর মাতৃসত্ত্বা জেগে ওঠেছে।'বসুমতী দুহাতে জড়িয়ে ধরে বুকে টেনে নেয় বালককে। বালকও আঁকড়ে ধরে বসুমতীকে আর দুজনে শান্ত জনবিরল রাজপথে হু হু কাঁদে বেশ জোরে জোরে।' (তদেব)

ওভার ব্রীজের তলায় ঘুমন্ত বসুমতী ওরফে ঢিলানীকে এক লম্পট গেটকিপার জোর করে ধর্ষণ করতে উদ্যত হলে সাত বছরের এই নামহীন ছেলে পাথর দিয়ে এই লম্পটের মাথা আঘাত করে। লম্পট মারা যায়। তারপর তারা পালাতে থাকে। পালাতে পালাতে বিস্মৃতির অবচেতন থেকে রাতুলের নাম মনে আসে বসুমতীর, 'ভাসা ভাসা অবচেতনায় ছুটন্ত বালকের হাত ধরে তাড়া দেয় বসুমতী। রাতুল, জোরে ছোটরে বাবা।' (পৃঃ ৩২৫) কোথায় পালাবে? বসুমতীরা তা জানেনা। দেশভাগ এভাবেই পালাতে বাধ্য করেছে সাধারণ মানুষদের, যারা হয়তো জানেই না দেশভাগ আসলে কী? প্রাণ বাঁচাতে ওরা পালিয়েছে বাস্তু থেকে, দেশ থেকে। তপোধীর ভট্টাচার্যের ভাষায়,'দেশভাগ আমাদের উন্মূল করার পরে আমরা প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে পালিয়েই চলছিঃ স্মৃতি ও সংস্কৃতি থেকে, বিবেক ও সংবেদনা থেকে স্বপ্ন ও প্রত্যাশা থেকে, মূল্যবোধ ও সহমর্মিতা থেকে, সত্য ও কল্যাণ থেকে। (পৃঃ ১০১; ২০১৬) দেশভাগ আসলে চরম এক মানবিক বিপর্যয়ের করুণ গাঁথা।এই করুণ বিপর্যয় গাঁথার এক ঝলক শেখরের অনুভবী কলমের ছোঁয়ায় বাণীরূপ পেয়েছে এই আখ্যানে।

গ্রন্থপুঞ্জী:

১। সেনগুপ্ত অমিতাভ,সম্পা 'ঈশান' আশ্বিন ১৪১৫, অন্বেষক - সামজিক সংস্থা, বদরপুর
২। ভট্টাচার্য তপোধীর, "দেশভাগ: নির্বাসিতের আখ্যান" সোপান ২০৬, বিধান সরণী, কলকাতা ৭০০০০৬